গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ২৭ সেপ্টেম্বর - ৩ অক্টোবর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

আসামে এনআরসি চূড়ান্ত জাতিবিদ্বেষী ও চরম সাম্প্রদায়িক

এই ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করুন

আসামের শোণিতপুর এলাকার দোলাবাড়ি গ্রামে শায়েরা বেগম কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। না, এনআরসি তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ যায়নি। তাঁর নিজের এবং পরিবারের সকলেরই তালিকায় নাম আছে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের আগেই পড়শিরা জানিয়েছিল, তাঁদের পরিবারের কারও নাম নেই এবং পুলিশ ধরলে তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। আতঙ্কে দিশাহীন হয়ে আত্মহত্যা করে বসেন তিনি। বাস্তবে আসামে চূড়ান্ত এনআরসি তালিকা (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) থেকে বাদ দিয়ে

৫ সেপ্টেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে পশ্চিম মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

দেওয়া ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জন নাগরিকের পরিবারই আজ এমন মারাত্মক আতঙ্কে ভুগছে। এনআরসি প্রক্রিয়া চলাকালীন এখন পর্যন্ত ৭২ জন আত্মহত্যা করেছেন। বহু মানুষ দুশ্চিন্তায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। চরম জাতিবিদ্বেষী, চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত এনআরসির মধ্য দিয়ে ১৯ লক্ষাধিক মানুষকে এক ধাক্কায় নাগরিকত্বহীন করে দেওয়া হল, তাঁদের মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে চরম অস্তিত্বসংকটে ফেলে দেওয়া হল, যা তাঁদের কাছে প্রায় মৃত্যুদণ্ডের সামিল।

তালিকায় যে ১৯ লক্ষাধিকের স্থান হয়নি তার বাইরেও রয়েছে স্থানীয় নানা উপজাতির বহু মানুষ, যাঁরা তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদনই করেননি। তাঁদের দাবি, তাঁরা আসামের সবচেয়ে পুরনো অধিবাসী। তা সত্ত্বেও তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে কেন? এ ছাড়া লক্ষ লক্ষ নাগরিককে সরকার ডি-ভোটার তথা সন্দেহজনক ভোটার ঘোষণা করেছে। তাঁদের অধিকাংশই ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও তালিকায় তাঁদের নাম তোলা হয়নি। বাকি যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকে তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণ জমা দিয়েছিলেন। অথচ চরম স্বেচ্ছাচারী কায়দায় তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা যে ষড়যন্ত্রমূলক জাতিবিদ্বেষী মানসিকতা থেকে এবং চরম ত্রুটিপূর্ণ ভাবে তৈরি করা হয়েছে, তালিকা প্রকাশের পরে তার অজস্র প্রমাণ বেরিয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে, আসামের স্থায়ী অধিবাসী, যাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেখানে বাস করছেন তেমন অজস্র মানুষের নাম চূড়ান্ত তালিকায় নেই। ১৯৭১ সালের আগে আসামে বসবাস করার প্রমাণ হিসাবে বাড়ির দলিল জমা দিয়েছেন এমন বহু মানুষের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার আসামের এক প্রান্তে যে নথি দেখে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়েছে অন্য প্রান্তে সেই নথিকেই গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বন্যা, ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন, ধস, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাঁরা পঞ্চাশ বছর আগেকার নথিপত্র হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা নাগরিকত্বের অন্য প্রমাণ জমা দিলেও সেগুলি গ্রাহ্য করা হয়নি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের পরিবারের সদস্যদের যেমন তালিকায় নাম নেই, তেমনই নাম নেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের লোকজনের, সেনাবাহিনীতে কয়েক প্রজন্ম কাজ করা মানুষদেরও। এমন অজস্র ঘটনা দেখা গেছে, একই পরিবারের বাবা-মার নাম থাকলেও

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভোটার যাচাইয়ে নতুন প্রক্রিয়া

মানুষকে হয়রান করার ফরমান

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ভোটারের তথ্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে, যা ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত চলবে। এতে ভোটার তালিকায় দেওয়া তথ্যগুলি নির্ভুল আছে কি না তা ভোটাররা যাচাই করে নিতে পারবেন। নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা নাকি এর উদ্দেশ্য।

এতদিন নির্ভুল তালিকা তৈরির জন্য একটি পদ্ধতি ছিল। নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ৩/৪ সপ্তাহ একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভোটার তালিকা নিয়ে বসতেন, ভোটাররা পরিবারের কারওর নতুন নাম তোলাতে বা ভোটার তালিকায় থাকা নামগুলিতে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করতে নির্দিষ্ট ফর্মে তার উল্লেখ করে ভোটার তালিকা নির্ভুল করতে সাহায্য করতেন। কিন্তু এবার এই যাচাই প্রক্রিয়ায় ঘোষণা অনুযায়ী ভোটারকেই কম্পিউটার বা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন থেকে কাজটি করতে হবে। এর ফলে এই রাজ্যের সাধারণ ভোটাররা বিশেষ করে গরিব মানুষ এক চরম হয়রানির মধ্যে পড়েছেন।

প্রথমত, এই কাজটি নির্বাচন কমিশন এমন সময়ে আরম্ভ করেছে, যখন আসামে এনআরসি তালিকা প্রকাশ করে ১৯ লক্ষ ৬ হাজারেরও বেশি মানুষকে রাষ্ট্রহীন করে দেওয়ার পর বিজেপি পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করে দু'কোটি মানুষকে রাষ্ট্রহীন করার হুমকি দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সরকার বা তাদের সমর্থকরা বলতে পারেন যে, এখন তো হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে। তাহলে অসুবিধা

পাঁচের পাতায় দেখুন

যাদবপুর ঃ খবরে থাকতে বিশৃঙ্খলাই সম্বল বিজেপির

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাচ্ছেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাঁর ব্যবহার কী রকম হবে? তাঁর সামনে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখালে তিনি অভব্য ব্যবহার করবেন, গালাগালি দেবেন, মেয়েদের কনুই দিয়ে মারবেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৌজন্যবশত দেখা করতে এলে মন্ত্রীমশাই তাঁকে উদ্ধত ভঙ্গিতে আদেশ করবেন আজ্ঞা পালনের জন্য! আর তাঁর সঙ্গী একদল বহিরাগত দুষ্কৃতী কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে গালাগালির বন্যা বইয়ে দেবে! আর কেন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিক্ষোভ করল সেই অজুহাতে মন্ত্রীমশাইয়ের দলবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর চালাবে, বিদ্যাসাগরের ছবি ও উদ্ধৃতি সম্পন্ন প্ল্যাকার্ড ছিঁড়বে, আগুন লাগাবে! এর নাম নাকি বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির 'নবীন বরণ উৎসব'!

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর বিজেপির মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় যাওয়ার পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার, পুরো ঘটনাটা ছিল বিজেপির পূর্বপরিকল্পিত। হতে পারে ছাত্ররা এই ধূর্ত পরিকল্পনাটি বুঝতে না পেরে তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। এ ঘটনা আরও স্পষ্ট হল যখন দেখা গেল এবিভিপি নেতৃত্ব এই ঘটনায় অত্যন্ত উল্লসিত বোধ করছেন, এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতিও তাণ্ডবের জন্য তাদের উৎসাহিত করেছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর,২০১৯)। পরিকল্পনা আরও বোঝা গেল যখন বিজেপি মন্ত্রীকে 'উদ্ধার' করতে রাজ্যের রাজ্যপাল দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন।

কী পরিকল্পনা ছিল বিজেপির? পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার জন্য তাদের এখন দরকার খবরে থাকা। তার জন্য কিছু গোলমাল, হইচই, বিশৃঙ্খলা ভাঙচুর করে তাদের ছবি তোলা দরকার। বেশ কিছুদিন বিজেপি তৃণমূলে মারামারি-খুনোখুনির খবর তাদের সংবাদমাধ্যমে ভাসিয়ে রেখেছিল। কাশ্মীর, এনআরসি এই সব নিয়ে কিছু গরম গরম কথা বলে বিজেপির রাজ্য নেতারা খবরে থাকার চেষ্টা করছেন। তার

চারের পাতায় দেখুন

বিদেশি নির্ণয়ের নামে ট্রাইবুনালের প্রহসন

একের পাতার পর

সন্তানদের নাম নেই, কিংবা সন্তানদের নাম থাকলেও বাবা-মার নাম নেই। স্বামীর নাম আছে স্ত্রীর নাম নেই কিংবা স্ত্রীর নাম আছে স্বামীর নাম নেই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকেও ফরেনার্স ট্রাইবুনালের শুনানিকে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় অনুষ্ঠিত বলে বলা হয়েছে। অসমে সক্রিয় একশোরও বেশি ট্রাইবুনাল ছোটখাটো অজুহাত দেখিয়ে ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় বহু মানুষের গায়ে 'বিদেশি' তকমা সেঁটে দিয়েছে। কোথাও ভোটার তালিকায় নামের বানান অথবা বয়স ভুল করার অজুহাত দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও জিজ্ঞাসাবাদের সময় উত্তরে সামান্য অসঙ্গতির জন্যও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে নাম। পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে দেখা গেছে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল যেন নাম বাদ দিতেই সক্রিয় থেকেছে। এনআরসির মাধ্যমে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয়দের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত কার্যকর করতে গিয়ে ব্যাপক বেআইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, ন্যায়বিচারের সমস্ত নিয়মনীতি এবং সংবিধানের বিধিগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি যে ষড়যন্ত্রমূলক তা বেরিয়ে এসেছে সরকারি ক্ষমতার জোরে এনআরসি কার্যকর করার মূল হোতা বিজেপিরই নেতা আসাম সরকারের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কথা থেকে। তিনি বলেছেন, 'এই এনআরসি তালিকা আসামের লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হবে না। কারণ একদিকে যেমন প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম বাদ গিয়েছে, তেমনই আবার বহু অনুপ্রবেশকারীর নামও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসামকে বিদেশি-মুক্ত করতে এনআরসির পরিবর্তে আমাদের এবার অন্য কোনও ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে।' (বর্তমান ঃ ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)। তা হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের কী সেই উদ্দেশ্য, যা ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েও চরিতার্থ হল না? সেই জঘন্য উদ্দেশ্যটি হল তালিকা থেকে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাম বাতিল করা। লক্ষ্যপূরণ না হওয়ার কথা বলে আসলে এই নেতারা সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে ভোটের স্বার্থে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিই চালিয়ে যেতে চাইছেন। গরিব মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী, ফ্যাসিস্ট কায়দায় অনুষ্ঠিত এনআরসি তালিকা তৈরি করতে গিয়ে যাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের ৯০ শতাংশই বাংলাভাষী। এ ছাড়াও রয়েছে বিহারি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি প্রভৃতি অন্য নানা প্রদেশের মানুষ, যাঁরা সকলেই ভারতীয়। এঁদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। লক্ষাধিক গোর্খা মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তালিকায় বাদ পড়া মানুষেরা তাঁদের এই চরম পরিণতির জন্য বিজেপির দিকে আঙুল তুলছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এনআরসি চালুর মধ্য দিয়ে বিদেশি বিতাড়নের হাওয়া তুলে ভোট জোগাড় করেছিল। এখন 'এই এনআরসি ঠিক নয়' বলে বাদ পড়া মানুষদের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। প্রচার করছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) নিয়ে আসতে চলেছে। এর ফলে বাদ পড়া সব হিন্দুই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ঘোষিত হবে।

বিদেশি নির্ণয়ে বিচারের প্রহসন

তালিকা থেকে বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে এখন নিজেদের ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করার জন্য ১২০ দিনের মধ্যে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে আবেদন করতে হবে। বাদ পড়া মানুষদের বেশিরভাগই অত্যন্ত গরিব, সমাজের নিচু তলার মানুষ। ট্রাইবুনালে যেতে হলে উকিল নিয়োগ করতে হয়, যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এ ছাড়াও আদালত, প্রশাসনিক দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে নতুন করে নথি সংগ্রহ করারও বিরাট খরচ। যা বহন করা এই গরিব মানুষগুলির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তা ছাড়া, এঁরা তো একবার এই প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতিতে তাঁদের সংগ্রহ করা যাবতীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে নাগরিকত্বের আবেদন করেছিলেন। তালিকা তৈরির সময় সেইসব প্রমাণ মান্যতা পায়নি। আবার একবার সেই ব্যয়সাপেক্ষ ট্রাইবুনালে গিয়ে তাঁরা আর কী নতুন নথি জমা দিতে পারবেন! ট্রাইবুনালে যাওয়ার সুযোগ আছে, এ কথা বলার দ্বারা তা হলে এই গরিব মানুষগুলির কী উপকারটা হবে!

ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কোনও বিচারবিভাগীয় সংস্থা নয়— আধা বিচারবিভাগীয় প্রশাসনিক সংস্থার মতোই কাজ করে এটি। এর বিচারক কারা? সাধারণ আইনজীবী এবং আমলারা— অ-বিচারবিভাগীয় ব্যক্তি। নাম নথিভুক্তির জন্য নথিপত্র পরীক্ষার দায়িত্ব কাদের দেওয়া হয়েছিল? ৪০ হাজার সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও ৮ হাজার অস্থায়ী কর্মীর উপর। অস্থায়ী কর্মীদের বেশির ভাগই শাসক উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী এবং বিজেপি-আরএসএসের অনুগত সরকারি কর্মচারী। তাদের উপর মারাত্মক প্রশাসনিক চাপও কাজ করেছে। তারা নিরপেক্ষভাবে কতটুকু কাজ করতে পেরেছে? নাগরিকত্বের অধিকার মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের সমতুল্য। এই রকম একটি মৌলিক বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এমন একদল লোকের উপর ছেড়ে দিয়েছিল সরকার। ফলে সমাজের নিচু তলার বাসিন্দা হতদরিদ্র ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের পদে পদে চরম অগণতান্ত্রিক এবং মনগড়া পক্ষপাতিত্বের শিকার হতে হয়েছে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে ডাহা মিথ্যা প্রচার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে যে আসামে স্রোতের মতো অনুপ্রবেশের যে গল্প প্রচার করা হয়েছে তা সত্য নয়। বাস্তবে সরকারি সমীক্ষাতেও বারে বারে প্রমাণ হয়েছে আসামে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে বলে আসু, অগপ, কংগ্রেস, বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে যে উগ্র জাতিবিদ্বেষে, মুসলিম বিদ্বেষে সারা রাজ্যকে জর্জরিত করে তুলেছিল, সেই দাবি মিথ্যা। এত রকমের ত্রুটি এবং প্রথম থেকেই ভাষিক ও সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মানসিকতা নিয়ে তৈরি এনআরসির চূড়ান্ত তালিকাও এস ইউ সি আই (সি)-র দাবিকেই প্রমাণ করল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে আসাম চুক্তি স্বাক্ষর করার পর উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ও জাতিবিদ্বেষী নেতারা অসম গণপরিষদ (অগপ) গঠন করে ১৯৮৫ সালে আসামের ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় বসেই এই সরকার 'বাংলাদেশি' কিংবা 'অনুপ্রবেশকারী' খোঁজার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। গায়ের জোরে এবং সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্টিক উপায়ে এই কাজ করা সত্ত্বেও অগপ সরকার সেদিন মাত্র ৮ হাজারের মতো ভাষিক ও সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে 'বিদেশি' বলে চিহ্নিত করেছিল। ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় বার অগপ সরকারে বসার পর 'বিদেশি'র সংখ্যা বেশি করে দেখাতে নতুন পদ্ধতি নেয়। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম 'ডি ভোটার', অর্থাৎ ডাউটফুল বা সন্দেহজনক ভোটার হিসাবে ইচ্ছামতো চিহ্নিত করতে শুরু করে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা কোনও আইনসঙ্গত পদ্ধতি বা বৈধতার ধার ধারেনি। চরম স্বেচ্ছাচারী কায়দায় লক্ষ লক্ষ গরিব নিরক্ষর মানুষগুলিকে জানতে না দিয়ে, সম্পূর্ণ একতরফা ভাবে তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ডি-ভোটার ঘোষণা করে দেওয়া হয়। বলা হয়েছিল, ছ'মাসের মধ্যে তথাকথিত ফরেনার্স ট্রাইবুনালের মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে তাঁদের ডি ভোটারের তকমা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত ডি-ভোটারদের উপরই। তারপর দু'দশকের বেশি অতিক্রম করে গেলেও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ডি ভোটাররা এখনও সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পাননি। ফলে বহু ভারতীয় নাগরিক ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম, জন্মসূত্রেই যাঁদের ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা, তাঁদের ডি ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়ে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। এরকম ডি ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার। এই ডি ভোটারদের বেশ কিছু মামলা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অজ্ঞাতে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে পাঠানো হয় এবং ন্যায়বিচারের মূল নীতিকেই পদদলিত করে একতরফা ভাবে তাদের 'বিদেশি' বলে ঘোষণা করা হয়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রবল চাপে যে আইএমডিটি অ্যাক্ট — ইললিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইবুনাল) অ্যাক্ট— চালু করা হয়েছিল তা প্রকৃত ভারতীয় ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষদের চূড়ান্ত হেনস্থা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছুটা নিরাপত্তা দিয়েছিল। কিন্তু জাতিবিদ্বেষী শক্তি এবং আরএসএস-বিজেপি জোটের মদতে আসু এই নিরাপত্তা বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। সুপ্রিম কোর্ট আইএমডিটি বাতিল করে দেয়। এর মারাত্মক ফল হল, ফরেনার্স ট্রাইবুনাল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের তৈরি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক 'ফরেনার্স অ্যাক্ট— ১৯৪৬' অনুযায়ী 'বিদেশি' নির্ধারণ করতে থাকল। এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী আইন, যা ভারতীয়দের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারকেও হরণ করেছিল। গণতান্ত্রিক আইনের গোড়ার কথা— অভিযোগকারীকেই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। এই আইনে একে পুরোপুরি লঙ্ঘন করে অভিযুক্তের ঘাড়েই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল। ফলে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র, নিরক্ষর ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল নিজেদের ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করার দায়িত্ব। স্বাভাবিক ভাবেই ফরেনার্স ট্রাইবুনালের তথাকথিত বিচারপতিরা তাদের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কাজ করেছেন এবং ইচ্ছেমতো ভারতীয় নাগরিক ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বিচারকরা তাঁদের সাবজেক্টিভ স্যাটিসফেকশন অর্থাৎ নিজেরা যা ঠিক মনে করেছেন তার দ্বারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারকদের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, বাঙালি বিদ্বেষী, মুসলিম বিদ্বেষী ঝোঁক কাজ করেছে। মানুষের বাঁচার অধিকারের (রাইট টু লাইফ) সমতুল্য নাগরিকত্বের অধিকার (রাইট টু সিটিজেনশিপ)। এই ভাবে আধা-বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনালে দরিদ্র অসহায় মানুষগুলির রাইট টু লাইফকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ট্রাইবুনালে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কত জন গরিব মানুষের ক্ষমতা রয়েছে হাইকোর্টে-সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার। সেখানেও

তিনের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার কমরেড শুক্লা কাউড়ী দুরারোগ্য লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে মেছেদায় পপুলার নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

উদারমনা, মিষ্টভাষী, নিরহংকারী একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসাবে এলাকায় সকলের অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন তিনি। সুগায়িকা এবং গল্প লেখিকা হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

২০০০ সাল নাগাদ ছাত্রাবস্থায় তিনি দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য হন। এলাকায় সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচি, মনীষী জয়ন্তী আয়োজনে তাঁর অগ্রণী উদ্যোগ ছিল। একটি সাংস্কৃতিক পাঠচক্র এবং 'স্বপ্ন সন্ধানী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন এবং দলের সংগঠন বিস্তারের জন্য তাঁর ছিল ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর ১১ বছরের একমাত্র কন্যা সন্তানকে পার্টির কোনও একটি সেন্টারে রেখে গড়ে তোলার জন্য তিনি দলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। স্বামী সহ সকল আত্মীয়-স্বজনকে তিনি এ বিষয়ে সহমতও করান। মৃত্যুর আগে হাসপাতালের বেডে তাঁর উপস্থিতিতেই কন্যার দায়িত্ব অর্পণের বৈধ ব্যবস্থা হয়, যা তাঁকে ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণাকে কিছুটা হলেও ভুলতে সাহায্য করেছে।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় ও দলের কর্মীদের মধ্যে প্রবল শোকের আবহ সৃষ্টি হয়। প্রথমে মেছেদায় দলের অফিসের সামনে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করা হয়। সেখানে পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও নেতা-কর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানোর পর মেদিনীপুর শহরের কর্নেলগোলায় দলের অফিসের সামনে মাল্যদান করা হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা এবং দলের নেতা-কর্মীরা সেখানে শ্রদ্ধা জানান। ২১ সেপ্টেম্বর গড়বেতায় তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পিসিএ-র উদ্যোগে স্মরণসভা ১ অক্টোবর ৪৮ লেনিন সরণিতে, সময় ১২.৩০ মিনিট।

কমরেড শুক্লা কাউড়ী লাল সেলাম

ইতিহাসের বিকৃতিই আসামের জাতিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সম্বল

দুয়ের পাতার পর

তো সেই প্রাদেশিকতাবাদী জাতিবিদ্বেষীরাই বিচারক। গরিব মানুষকে তারা চোখ বন্ধ করে কোতল করবে। এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। ফলে গরিব মানুষের কাছে ট্রাইবুনাল-কোর্ট প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, পদ্ধতিগত নানা কারচুপি, নিয়ম-কানুনের ব্যাপক লঙ্ঘন সত্ত্বেও আর্থিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী যে ডি ভোটাররা আইনের সাহায্য নিতে পেরেছেন তাঁদের ৯৭ শতাংশেরই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণিত হয়। এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাঁদের আড়াই দশক আগে ডি-ভোটার ঘোষণা করা হয়েছিল, এখন তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাও প্রাপ্তবয়স্ক। তাঁরাও নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এ দেশে জন্মানো, বড় হওয়া, লেখাপড়া শেখা, এ দেশের নানা কাজে নিয়োজিত এই মানুষগুলিকে কেন নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না? রাষ্ট্র কেন এঁদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করবে? জন্মসূত্রে যে নাগরিকত্ব তাঁদের ন্যায্যত প্রাপ্য, কেন তাঁদের সেই নাগরিকত্ব সরকার দেবে না?

বাস্তবে এনআরসি প্রকাশ করার পিছনে বুর্জোয়া শাসকদের সমর্থনপুষ্ট জাতিবিদ্বেষী-উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির একমাত্র মতলব হল ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় জনগণকে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া এবং তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া। দেশের শোষিত জনগণকে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করার পাশাপাশি নাগরিক এবং নাগরিকত্বহীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া। দীর্ঘদিন ধরেই নানা রকমের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আসামে সক্রিয়। সেখানকার অ-অসমীয়া ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে অসমীয়াভাষী সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা প্রচার করেছে, অ-অসমীয়া অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলবে, অসমীয়াভাষীদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবে, তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে এবং এইভাবে কার্যত তাদের গ্রাস করে ফেলবে।

এস ইউ সি আই (সি) সেদিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আসামের মানুষকে বলেছিল, এই জাতিবিদ্বেষীদের আসল লক্ষ্য হল, জনগণের দৃষ্টিকে তাদের দারিদ্র, দুর্দশার প্রকৃত কারণ থেকে সরিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত দাঙ্গায় মাতিয়ে দেওয়া। বলেছিল, অসমীয়াভাষী জনগণ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এ প্রচার ডাহা মিথ্যা, কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটি পুরোপুরি রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যা এখন ভারতের শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং তাদের তাঁবেদারদের দখলে। বলেছিল, ইতিহাসে এমন কোনও উদাহরণ নেই যেখানে দেখা যায় এক অংশের দরিদ্র মানুষ অপর অংশের দরিদ্র মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছে বা তার ক্ষতি করেছে বা তাদের অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করেছে। শুধুমাত্র নিপীড়নকারীরাই নিজেদের শোষণমূলক শ্রেণি শাসন বজায় রাখার স্বার্থে জনগণের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে বিপন্ন করে তোলে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের শত্রু শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে একে অপরের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে একে অপরের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়।

যুক্তি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস-বিজেপির আজকের এই বাড়বাড়ন্ত রাতারাতি ঘটেনি। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে অবিভক্ত আসাম পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলার গোয়ালপাড়া ও সিলেট জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে চিফ কমিশনারের প্রদেশ হিসাবে একে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৯১৩ সালে একটি বিধান পরিষদ এবং ১৯৩৭ সালে আসাম বিধানসভা গঠিত হয়। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় দিক থেকে উত্তর-পূর্ব আসাম রাজ্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। বহু ভাষা, ধর্ম, জনজাতির মানুষের বাসভূমি এই রাজ্যে কোনও অংশের মানুষই সংখ্যাগুরু ছিলেন না। হাজার হাজার বছর ধরে নিজস্ব রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতার পর আসামের সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ, অসমীয়া, অ-অসমীয়া, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলেই দেখলেন, বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়ে তাঁরা যখন কার্যত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন সমস্ত সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তি। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং পৌর সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের দুর্দশা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপক প্রতারণা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রমাগত ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

এই ক্ষোভ যাতে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ নিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে শাসক কংগ্রেস অন্যান্য উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সঙ্গে একযোগে মিথ্যা প্রচার শুরু করে। ধীরে ধীরে সেই প্রচারকে তুঙ্গে তুলে প্রথমে বাংলাভাষী হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং পরে বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে 'বেআইনি বসবাসকারী' ও 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে দাগিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের জেহাদ শুরু করল। শাসক কংগ্রেস দেখল, এই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আবহাওয়া বজায় রাখতে পারলেই এই ক্ষোভকে বিপথগামী করে দেওয়া যাবে। তা হলে আর তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না।

উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আসাম আন্দোলনের ডানায় ভর করে ১৯৭৯ সালে সরকারি ক্ষমতা পুনর্দখলের লক্ষ্যে কংগ্রেস নেতারা আসুকে সামনে রেখে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের সেই সময় সন্দেহ ও আক্রমণের লক্ষ্য বানানো হয়েছিল। পরিকল্পিত উপায়ে আসামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেহনতি মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিভেদের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৭৯ থেকে '৮৫ পর্যন্ত চলা আসাম আন্দোলনের হোতা অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তথা 'আসু'-র বহু নেতা ও কর্মী ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী।

ফ্যাসিস্ট হিটলারের কুখ্যাত প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস বলেছিলেন, কোনও মিথ্যা বারবার বলে যেতে থাকলে একসময় মানুষ তা সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। কংগ্রেস, আসু সহ আসাম আন্দোলনের জাতিবিদ্বেষী হোতারাও তাই করেছেন। শ্বাসরোধকারী জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির দিশা না পাওয়া দরিদ্র হতভাগ্য অসমীয়াভাষী মানুষদের এই উগ্র জাতিবিদ্বেষী প্রচারে ভাসিয়ে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র করে তারা। তাঁদের আরও তাতিয়ে তোলার জন্য এই নেতারা প্রচার তুলল, প্রতিদিন হাজার হাজার বাংলাদেশি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আসামে প্রবেশ করছে এবং ইতিমধ্যে ৪০-৫০ লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি বেআইনিভাবে আসামে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই সময় সংবাদপত্রেও এমন সব পরিসংখ্যান প্রকাশিত হতে থাকল। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, এদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় নেলি, মুকালমোয়া, চালখোয়া, সিলাপাথার, দরং, লখিমপুর, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, বরপেটা এবং আরও বহু জায়গায় একের পর এক ভয়ঙ্কর গণহত্যা ঘটতে থাকল এবং ধর্মীয় এবং সংখ্যালঘুভুক্ত বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল।

ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্র

এই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক নেতারা আওয়াজ তুলেছিল, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ির মতো ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার জেলাগুলিতে বসবাসরত বাংলাভাষী মুসলমান ধর্মের মানুষরা সকলেই বাংলাদেশ থেকে আসা 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী', ফলে তারা 'বিদেশি'। এ হল ইতিহাসের অপরাধমূলক বিকৃতি। বিশ শতকের প্রথম দিকে আসাম এবং পূর্ববাংলা উভয়েই ছিল প্রশাসনিক ভাবে একই কমিশনারের অধীন। উভয় অঞ্চলই ছিল একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। একই জেলা থেকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্য জেলায় যাতায়াত খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ভূমিহীন বাংলাভাষী মুসলমান চাষিরা জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমি তৈরি করা এবং চর এলাকার পতিত জমিগুলিকে উর্বর কৃষিজমিতে পরিণত করার কাজে দক্ষ ছিলেন। ফলে তৎকালীন অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার জমিদাররা নিজেদের মালিকানাধীন অকৃষিযোগ্য পতিত জমিগুলিতে বসবাস করার জন্য ময়মনসিংহ, রংপুর ও পাবনা জেলার এই সমস্ত পরিশ্রমী মুসলমান চাষিদের উৎসাহিত করত। ব্রিটিশ সরকারেরও এতে আপত্তি ছিল না, কারণ এর ফলে তাদের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেত। এই দরিদ্র চাষিরা যাতে স্থায়ীভাবে ওই এলাকায় বাস করে সেজন্য কোনও কোনও জমিদার এমনকি জিনিসপত্র দিয়েও তাদের সাহায্য করত। সেই সময় অসমীয়াভাষী সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার সঙ্গেই এই মানুষগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই কারণেই আসামের এই এলাকায় এখনও বিরাট সংখ্যক বাংলাভাষী মুসলমান মানুষ বাস করেন যাঁদের অধিকাংশ চাষের কাজে নিযুক্ত। ফলে এটা কোনও ভাবেই অনুপ্রবেশ ছিল না, ছিল দেশের এক অংশের মানুষের অন্য অংশে স্বাভাবিক আসা-যাওয়া, স্বাভাবিক পথে বসবাস করা, যা অসমীয়াভাষী মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অ-অসমীয়াভাষী সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই সেই সময় সাহায্য করেছে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে নিম্ন আসামের বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও অপর একটি বড় অংশ, যাঁরা ভারতকেই তাঁদের আপন দেশ বলে মনে করলেন, তাঁরা এদেশেই থেকে যান। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নিম্ন আসামের মুসলমান জনগণ এ দেশে বসবাস করার জন্য এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আপসে থাকতে গিয়ে অসমীয়া ভাষাকেই তাঁদের নিজেদের ভাষা বলে মেনে নেন। আজও পর্যন্ত তাঁরা সেই ভাষাতেই পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ করে আসছেন। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও এবং এ সব জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র গায়ের জোরে আসামে আজকের উগ্র জাতিবিদ্বেষীরা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী আরএসএস-বিজেপিরা দাবি করছে, এই ভারতীয়দের উত্তরপুরুষরা, যাঁরা এ দেশে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন এবং যাঁরা এ দেশেরই দরিদ্রতম অধিবাসীদের একটি অংশ, তাদের সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস চেপে দিয়ে অবিরাম প্রচার করেছে— এরা অনুপ্রবেশকারী। যারা উদ্বাস্তু তাদের উপরও চলছে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে তাদের নাগরিকত্ব হরণ করার জঘন্য চক্রান্ত।

বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, এমনকী সিপিআইএম, সিপিআই এর মতো দলগুলি, যাদের একসময় আসামের মানুষের মধ্যে কিছুটা সমর্থন ছিল, এই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সংকীর্ণতাবাদী চিন্তার ফল কী মারাত্মক হতে পারে তা ধরতে ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্ট নামধারী এই দলগুলি আসামে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও এই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে কখনওই আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তোলেনি। আসলে তারা নিজেরাই এই প্রাদেশিকতাবাদী চিন্তার শিকার। ভোট রাজনীতির সুবিধা পেতে একসময় এমনকি এই মারাত্মক জাতিবিদ্বেষী শক্তিগুলির সাথে তারা নির্বাচনী জোটও গড়ে তোলে। ১৯৯৬ সালের অগপ সরকারের শরিক ছিল সিপিআই এবং সিপিএম সেই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল।

একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) আসাম পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করেছিল

নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলার যে আশঙ্কা সাধারণ অসমীয়াভাষী মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা যে সত্য নয়, যথার্থ প্রেক্ষাপটে সেই কঠিন পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) তা নানা দিক থেকে তুলে ধরেছে এবং সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে আজও এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্যার গভীরে গিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দেখিয়েছিল, ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। আসামে এই বিভাজন অসমীয়া এবং বাঙালিদের মধ্যে অথবা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নয়। বিভাজনটা হল একদিকে হাতেগোনা উঠতি ছোট-মাঝারি পুঁজিপতি শ্রেণি, আর অন্য দিকে ভাষা, ধর্ম, জাত, বিশ্বাস নির্বিশেষে অগণিত নিপীড়িত নিঃসম্বল সাধারণ মানুষের মধ্যে। যত দিন যাচ্ছে সারা দেশের মতো আসামেও ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, গরিব মানুষ আরও গরিবির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই ৯৯ ভাগ শোষিত আর এক ভাগ শোষকের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না, বরং তা সম্পূর্ণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ককর্মী সম্মেলন

১৪ সেপ্টেম্বর কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ককর্মীদের প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন হল শিলিগুড়ি শহরে। ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ভেনাস মোড়ে যাদব সমিতি হলে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ রায়। বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি, অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সহসভাপতি পূর্ণচন্দ্র বেহেরা সহ রতন কর্মকার, কৃষ্ণগৌরাঙ্গ সাহা, গোপাল সাহা প্রমুখ।

প্রতিনিধি অধিবেশনে সাংগঠনিকপ্রতিবেদন পেশ করেন নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত তহবিল থেকে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫১ কোটি টাকা সরকারি তহবিলে সরানো, অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমকাজে সমবেতন, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রভৃতি দাবিতে এবং যখন তখন ছাঁটাই, উপযুক্ত বেতন না দেওয়া, ইএসআই, পিএফ, গ্র্যাচুইটির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের নামকরণ হয় কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক অ্যান্ড আদার এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ। সম্মেলনে জগন্নাথ রায়মণ্ডলকে সভাপতি এবং নারায়ণচন্দ্র পোদ্দারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মদবিরোধী বিক্ষোভ ভবানীপুরে

মদ নিষিদ্ধ করা ও চক্রবেড়িয়া হকার্স কর্নার মোড়ে নিয়মিত ট্র্যাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা করার দাবিতে মাসাধিক কাল ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পর ১৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) ভবানীপুর আঞ্চলিক কমিটি ভবানীপুর থানায় বিক্ষোভ দেখায়। ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল ওসি-কে স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেয়। ওসি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পরিষেবার দাবিতে পৌর দপ্তরে বিক্ষোভ

সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে থাকে দীর্ঘক্ষণ। যেখানে সেখানে স্তূপ করে রাখা আবর্জনা সেই জলে ভেসে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। খোলা ডাস্টবিন থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মশা-মাছির আক্রমণ মারাত্মক। ডেঙ্গুর প্রকোপও সাংঘাতিক। পানীয় জল থেকে প্রায়ই আসে কটু গন্ধ। রাস্তাগুলিও নানা জায়গায় ভাঙা, খানা-খন্দে ভরা। কলকাতায় জোড়াসাঁকো বিধানসভার অন্তর্গত অনেকগুলি ওয়ার্ডে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি। অবিলম্বে এর প্রতিকারের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২০ আগস্ট এবং ১৮ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ৫ ও ৪ নম্বর বরো দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করে এসইউসিআই (সি) জোড়াসাঁকো লোকাল কমিটি।

বিধাননগরে রাস্তা সারানোর দাবিতে আন্দোলন

বিধাননগরে রাস্তা এবং ফুটপাত সারানো, ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা, আয়রণ মুক্ত পানীয় জল, খালি প্লট ও ট্যাঙ্কগুলির পাশের জঙ্গল ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা, রাস্তায় উপযুক্ত আলো, বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণ সহ ৬ দফা দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) বিধাননগর পৌরভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মেয়রের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মেয়র দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ডিএসও-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

১৪-১৫ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কুলতলির জামতলায়। প্রাইমারিতে পাশ-ফেল চালু, জেলায় নতুন কলেজ তৈরি, ফেরি এবং সমস্ত পরিবহণে ভাড়া কমানো সহ নানা দাবিতে সম্মেলনে জেলার প্রায় সমস্ত ব্লক থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। কমরেড সুশান্ত ঢালীকে সভাপতি, অরবিন্দ প্রামাণিককে সম্পাদক এবং শুভেন্দু মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৮ জনের জেলা কমিটি ও ৭০ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়।

বল্লুক গ্রাম পঞ্চায়েতে জলবন্দি মানুষের বিক্ষোভ

১৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক-২ অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি) রামতারক হাট লোকাল কমিটির আহ্বানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। মাত্র দু'দিনের ভারী বর্ষণে এলাকার রাস্তা-ঘাট, পান বরজ, ধান, পুকুরের মাছের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এক মাসের বেশি সময় বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তা জলের তলায়। অবিলম্বে জল নিকাশির দাবিতে রামতারক হাটে ঢোকার রাস্তা ১ ঘণ্টার বেশি অবরোধ করা হয়। অবরোধ তুলতে পুলিশ এবং র‍্যাফ আসে। অঞ্চল প্রধান কথা দেন যে, অতি দ্রুত খালগুলি পরিষ্কার এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া রাস্তা আপৎকালীন মেরামত করা হবে। সোয়াদিঘী খালের মূল স্রোতের বাধা দূর করার কথা দেন তিনি। এরপর অবরোধ ওঠে।

হিড়বাঁধে রাস্তা সারাইয়ের দাবি

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের তিলাবনি মলিয়ান যাওয়ার রাস্তা বেহাল হওয়ায় তা অবিলম্বে পুনর্নির্মাণের দাবিতে ১৩ সেপ্টেম্বর হিড়বাঁধ লোকাল কমিটির উদ্যোগে অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হয়। লেদাকেন্দির মোড়ে ১ ঘণ্টারও বেশি অবরোধ চলার পর পুলিশ ও ব্লকের জয়েন্ট বিডিও উপস্থিত হয়ে পুজোর আগেই কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

যাদবপুর

একের পাতার পর

সাথে সুযোগ বুঝে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার অজুহাতে তারা বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, আগুন লাগানোর মতো কাজ করে আবার খবরের শিরোনামে উঠতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যাদবপুরের ছাত্রীদের উদ্দেশে যে অতি নোংরা মন্তব্য করেছেন তা করতে দাগি সমাজবিরোধীরাও লজ্জা পেত। অবশ্য যে দলের একের পর এক এমএলএ ধর্ষণে অভিযুক্ত, যে দলের মন্ত্রী পর্যন্ত একজন শিশুকন্যার ধর্ষণকে সমর্থন করে মিছিল করতে পারে, তাদের পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি তাঁর কন্যাসম ছাত্রীদের নিয়ে এই রকম উক্তি করতেই পারেন। এটা তাঁর দলীয় সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভাবতে হবে, এইরকম একটি দল, যাদের লাঠিধারী ফেট্টিবাঁধা গুণ্ডাবাহিনীর বীভৎস রূপ ১৯ সেপ্টেম্বর যাদবপুরের রাস্তায় দেখা গেছে তাদের কোনও অজুহাতে, কোনও কারণে এ রাজ্যে ভোটে জিতে আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠতে দেওয়া চলে কি? এই মারাত্মক শক্তিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের ধাক্কায় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই ছুঁড়ে ফেলা দরকার।

শিলিগুড়িতে আশাকর্মীদের দাবি আদায়

আশাকর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন, পি এফ, পেনশন, বোনাস চালু, 'দিশা' ডিউটি বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল এবং সিএমওএইচের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে কমরেড জয় লোধ। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্লক থেকে বক্তব্য রাখেন, সাবিনা তিথিও, বনানী সাহা, পলি আচার্য, নমিতা সূত্রধর, শর্মিলা সিংহ প্রমুখ। নমিতা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল সি এম ও এইচের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তিনি জেরক্স-খাতা-কলমের টাকা, প্রত্যেক বুধবার সরকারি ছুটি থাকলেও টাকা দেওয়া, মাস্থলি মিটিং-এ যাতায়াত ও টিফিন বাবদ টাকা বরাদ্দ, নার্সিং হোমে প্রসব হলে টাকা পাওয়ার বিষয়টি মেনে নেন।

আসামে মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন বিজেপি সরকারের পুলিশের

হরিয়ানা কিংবা উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের পুলিশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই চলছে আসামের বিজেপি সরকারের পুলিশ। সেই কারণেই ভিন্ন ধর্মে বিয়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দরং জেলায় তিন মহিলাকে গভীর রাতে সিপাহঝাড়ের বুঢ়া পুলিশ চৌকিতে তুলে নিয়ে গিয়ে নগ্ন করে পাশবিক নির্যাতন চালালো পুলিশ। ৯ সেপ্টেম্বরের এই ঘটনায় থানার মধ্যেই এক নির্যাতিতার গর্ভপাত ঘটে যায়। এই খবর পেয়েই এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে ছাত্র-যুব-মহিলারা আন্দোলনে নামেন। তাঁরা দাবি তোলেন, দোষী পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, অত্যাচারিত মহিলাদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর এই দাবিতে দরং-এর জেলাশাসক দপ্তরে তিন সংগঠনের ডাকে শত শত মানুষ বিক্ষোভ দেখান। নেতৃবৃন্দ জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

মদ নয়, কাজ চাই— হুগলিতে বিক্ষোভ মিছিল

১৭ সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া ব্লকে বৈঁচী রাজপুরে 'বৈঁচী মদ বিরোধী মহিলা ও যুব কমিটি'র উদ্যোগে মদের দোকান বন্ধ করা, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা, সকল বেকার ও ছাঁটাই-কর্মচ্যুত মানুষের হাতে কাজ ও পেটে ভাতের ব্যবস্থা করা, এলাকায় বন্ধ হয়ে থাকা একশো দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা হয়। সভায় চন্দনা রায়, পিরু মাঝি, ছবি মাণ্ডি, এবং শ্যামলী কুমার সমাজে মদের কুপ্রভাব ব্যাখ্যা করে তার জন্য সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী করেন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ছাত্র ও অভিভাবকদের আন্দোলন

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া, সরকারি তহবিলের কয়েক লক্ষ টাকা তছনছ, মিড-ডে মিলে নিম্নমানের খাবার ও ব্যাপক দুর্নীতি— এ সবের প্রতিবাদে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার চণ্ডীপুর হাইস্কুলে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র-অভিভাবক সংগ্রাম কমিটি। ঘেরাও করা হয় প্রধান শিক্ষককে। ক্লাস বন্ধ রেখে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে ছাত্রছাত্রীরা।

প্রধান শিক্ষক বাড়তি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিটির সভাপতি মোসারফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল আলি বলেন, সমস্যা না মিটলে আরও বড় আন্দোলন হবে।

ওড়িশায় কৃষক বিক্ষোভ

অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের ডাকে
ভুবনেশ্বরে ওড়িশা বিধানসভার সামনে ১৬ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ কৃষক ও খেতমজুরদের

ভোটার যাচাইয়ে নতুন প্রক্রিয়া

একের পাতার পর

কোথায়? কিন্তু এ দেশের বহু গরিব মানুষের হাতে মোবাইল ফোন এলেও লগ-ইন করা, ক্যাপচা দেওয়া, নতুন রেজিস্ট্রেশন করা, ওটিপি দেখে পাসওয়ার্ড বসানো, সফ্‌ট কপি আপলোড করা ইত্যাদি তাঁরা করতে পারবেন না। ফলে তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে রুটি-রুজির কাজের সময় নষ্ট করে দৌড়তে হবে কমপিউটার সেন্টারে। সেখানে দিতে হবে টাকা। একার নয়, পরিবারের প্রত্যেক ভোটারের জন্য।

তৃতীয়ত, কমপিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে যদি সব বিবরণ ঠিক আছে দেখা যায়, তাহলে সেখানেই যাচাইয়ের কাজটি শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু না। নির্বাচন কমিশন নিজে আগে যাচাই করে যে সব তথ্যের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিল, তা নির্বাচন কমিশনই বিশ্বাসযোগ্য মনে করছে না। তাই আরেকবার প্রমাণপত্র হিসাবে ভোটারকে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্কের পাশবই, প্যানকার্ড, সাম্প্রতিক জল/ টেলিফোন বিল / বিদ্যুৎ / গ্যাস এর বিল (ঠিকানা সহ) / সরকারি বা আধা-সরকারি পরিচয়পত্র / নির্বাচন কমিশন দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য নথির যে কোনও একটি আপলোড করতে হবে। কী দরকার আছে এর?

চতুর্থত, সব বিবরণ ঠিক না থাকলে আবার আরেক ঝামেলা। চেকবক্সে ত্রুটি সংশোধন করে, তার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। তা আবার ২ এমজি-র কম সাইজের হতে হবে। তার পর আসবে ত্রুটি সংশোধনের ৮নং ফর্ম। সেখানে সর্বোচ্চ তিনটি ফিল্ড সংশোধন করা যাবে। অর্থাৎ নাম, বাবার নাম, লিঙ্গ, বয়স, ছবি ইত্যাদিতে যদি মোট চারটি ভুল থাকে তাহলে আপনি মাত্র তিনটিতে সংশোধন করতে পারবেন। তাহলে এত কাণ্ডের পর সম্পূর্ণ নির্ভুল তালিকা হল কোথায়?

পঞ্চমত, পরিবারের প্রত্যেকের ভোটার তালিকা এক এক করে যাচাই করতে হবে একই প্রক্রিয়ায় এবং তা এক দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠত, যারা পরিবারে একসাথে থাকেন, তাদের নাম একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল, তাদের নাম একত্রিত করার দরকার কি? আজ যারা একত্রিত, কাল তো তারা আলাদা হয়ে যেতে পারেন! নির্বাচন কমিশনের পারিবারিক বিষয়ে ঢোকার দরকার কি? এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে। এ কি শুধু নির্ভুল নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা না কি আরও কিছু?

সপ্তমত, অনেকেই এই ঝঞ্ঝাট এড়াতে ভোটার তালিকা যাচাই নাও করতে পারেন। তাদের কী হবে? তারা কি ডাউটফুল ভোটার বলে গণ্য হবেন?

আসামে কয়েক বছর আগে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় ডাউটফুল ভোটার বা ডি-ভোটার তৈরি করেছিল। তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তাদের শুনানির জন্য ডেকে, যারা নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দিতে পারেননি, তাদের কয়েক হাজারকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রেখেছে সরকার। তার পর এসেছে এনআরসি। এবার তৈরি হচ্ছে আরও বড় আকারের বহু সংখ্যক ডিটেনশন ক্যাম্প, যা মানুষের মধ্যে নানা রকম আশঙ্কা তৈরি করছে।

সরকার আবার এর মধ্যেই ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিজেপি নেতাদের এ রাজ্যে দু'কোটি মানুষকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করার ঘোষণা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নাগরিক পঞ্জি নিয়ে আস্ফালন, রাষ্ট্রহীনদের 'উইপোকার মতো টিপে মারা'র হুমকি বহু মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোটার তালিকা যাচাই বা ডিজিটাল রেশনকার্ডের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। এতদিন বিজেপি এনআরসি এবং বিদেশি বিতাড়ন প্রশ্নে মুসলিমদের দিকে আঙুল তুললেও আসামের এনআরসি তালিকা অন্য সত্যকেই সামনে এনেছে। আসামের এনআরসি তালিকায় দেখা যাচ্ছে শুধু হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাঙলাভাষী মানুষই নয়, যাঁদের কোনওদিনই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের প্রশ্নই নেই, জনজাতির সেইসব মানুষকেও বিদেশি বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বোড়ো ২০ হাজার, রাভা ৮ হাজার, হাজং ৮ হাজার, মিচিং ৭ হাজার, কার্বি ৯ হাজার, অহোম ৩ হাজার, গারো ২.৫ হাজার, সোনোয়াল ১১ শ, ডিমাছা ১১ শ, মটক ১.৫ হাজার, গরিয়া-মরিয়া-দেশি ৩৫ হাজার, কোচ-রাজবংশী ৫৮ হাজার, গোর্খা ৮৫ হাজার। এছাড়া নাগা, মণিপুরি, মার, কুকি, থাদৌ, বাইফে প্রভৃতি জনজাতিরও অনেকের এনআরসি-তে নাম নেই। নাম না থাকা পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম ৪.৮৬ লক্ষ হলেও সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যা হল হিন্দু বাঙালি, যার সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। আরও প্রায় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ কোন জাতি বা গোষ্ঠীর তা এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হলেও একথা বলা যায় যে, সব মিলিয়ে হিন্দু প্রায় ১৩ লক্ষ। ফলে এনআরসি নিয়ে এ রাজ্যে যে আতঙ্ক কিছুদিন আগে মূলত মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে, সেই আতঙ্ক এখন সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিশেষ করে মতুয়া, মুসলিম, আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রবলভাবে।

কোনও গণতান্ত্রিক শাসনে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নাগরিকত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না

তিনের পাতার পর

বিপরীত। ফলে আসাম সমস্যার বিচারটাও এই সত্যের উপর দাঁড়িয়েই করতে হবে।

অত্যন্ত সংবেদনশীল আসাম সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করে এ সংক্রান্ত বিতর্কের যথার্থ সমাধানের জন্য এস ইউ সি আই (সি) নিম্নলিখিত চার-দফা সূত্র পেশ করেছিল ঃ

১) নিজেদের মাতৃভাষা সম্পর্কে অসমীয়াভাষী জনসাধারণের ভাবাবেগের কথা চিন্তা করে রাজ্যে রাজ্য-ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষার যে বর্তমান মর্যাদা, জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে তাকে স্থায়ী করার জন্য হয় সংবিধান সংশোধন করতে হবে, না হলে পার্লামেন্টে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। ছোট-বড় ভাষিক সংখ্যালঘুদের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার অক্ষুন্ন রেখেই তা করা সম্ভব এবং তাই করতে হবে।

২) অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো করে সীমান্ত নিশ্ছিদ্র ভাবে সুরক্ষা করতে হবে।

৩) আসামে শিল্প ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটানোর জন্য সরকারকে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।

৪) বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের দাবি মতো ১৯৫১ সাল নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে কাট-অফ তারিখ তথা ভিত্তিবর্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত স্বীকৃত ও প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম, আইন ও রীতিনীতি মেনে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি চালাতে হবে। উক্ত কাট-অফ তারিখের আগে যাঁরা এ দেশে এসেছেন, তাঁদের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই বিদেশি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন) মেনে চলতে হবে এবং জাতীয় দায়বদ্ধতাকেও (ন্যাশনাল কমিটমেন্ট) মেনে চলতে হবে।

অসমীয়াভাষী এবং অ-অসমীয়াভাষী উভয় জনগণই এই চার-দফা সমাধান সূত্রকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আসাম আন্দোলনের হোতা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত শক্তিগুলি সহ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ জিইয়ে রাখাই যাদের স্বার্থ, তারা এই চার-দফা সূত্রকে এড়িয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত এনআরসি চালু করলেন। যার পরিণতিতেই ১৯ লক্ষাধিক ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় অধিবাসী আজ নাগরিকত্বহীন।

ডিটেনশন ক্যাম্প কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের থেকেও জঘন্য

তালিকা থেকে বাতিল হওয়া ১৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে ট্রাইবুনাল-কোর্টে গিয়েও যাঁরা নানা জটিলতার কারণে তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হবেন তাঁদের পরিণতি কী হবে? লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে কি শেষ পর্যন্ত ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে। ডিটেনশন ক্যাম্পগুলি বাস্তবে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের থেকেও জঘন্য। ইতিমধ্যেই অজস্র মানুষ এই ক্যাম্পে হয় মারা গেছেন, না হয় এর ভয়ঙ্কর জীবন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। জেলখানা কখনও স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে না। ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তেমনই বাংলাদেশ সরকারও জানিয়ে দিয়েছে এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ফলে কাউকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয় নেই। এই অবস্থায় যদি কেউ বিদেশি বলে চিহ্নিতও হন তাঁদের আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি মেনে এ দেশেই আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এভাবে ডিটেনশন ক্যাম্পের নামে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প কখনও চলতে পারে না ।

এক দেশ থেকে আর এক দেশে মানুষ শখ করে যায় না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা এ দেশে এসেছিলেন তাঁরা শখ করে আসেননি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে এবং দেশীয় ক্ষমতালোভী নেতাদের সহযোগিতায় দেশভাগের বলি হয়ে সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুর মতো তাঁরা এসেছেন। এর জন্য তাঁরা নিজেরা দায়ী নন। দায়ী যে শাসক শ্রেণি তারাই আজ আবার তাঁদের বিদেশি বলে কাঠগড়ায় তুলছে। এ তো দেশ ভাগের বলি একই ভাষাভাষি মানুষদের প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়। যুদ্ধ, জাতিগত দাঙ্গা প্রভৃতি নানা কারণে এশিয়া-আফ্রিকার নানা দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে হাজার হাজার মানুষ সমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপের দেশগুলিতে ঢুকছে। সেখানকার জনগণের চাপে সরকারগুলির প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে। যে মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছেন, তাঁদের অনেকেই এখানে জন্মেছেন, এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে নিজেদের জড়িত করে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করছেন। এ ভাবে তাঁরা এই সমাজেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছেন। নাগরিক দায়িত্বও পালন করছেন। তা হলে তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে কেন?

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের তাঁবেদার রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শোষণ-শাসন অব্যাহত রাখার জন্য শোষিত জনগণকে জাতি-ধর্ম-ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করে দুটো যুধ্যমান শিবিরে— একদল যাদের নাগরিকত্ব আছে, আর এক দল যাদের নাগরিকত্ব নেই— বিভক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই এনআরসি প্রক্রিয়াটি চালু করেছে, ঠিক যেমন ব্রিটিশ শাসকরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে দেশের মানুষকে ভাগ করে রেখেছিল। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্দেশ্য— সমস্ত বিষয়ে এই দুই দলকে একে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। এনআরসির নামে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি এই মারাত্মক খেলাটাই খেলতে চাইছে।

চক্রান্তকারীরা আরও মারাত্মক আক্রমণ হানছে

কিন্তু ১৯ লক্ষে খুশি নয় আসামের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। উগ্র জাতিবিদ্বেষী আসু ও অগপ-র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলাভাষীদের বিতাড়িত করা। অন্য দিকে আরএসএস-বিজেপির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষী মুসলিমদের বিতাড়িত করা। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর আরও বেশি সংখ্যায় অ-অসমীয়া মানুষের নাম বাতিলের দাবিতে নির্লজ্জ এবং একতরফা প্রচার শুরু করে দিয়েছে এই দুই শক্তি। এই প্রচারে সরকার এবং বিরোধী দলগুলি সব এক। একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই জাতিবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে দরিদ্র নিপীড়িত অসহায় শোষিত মানুষগুলির পক্ষে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। এই দুষ্টশক্তিগুলি এখন আবার নতুন করে দাবি তুলেছে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ১৯৫১ সালকে ধরা হোক। এ যদি সরকার মেনে নেয় তবে বহু কষ্ট করে যাঁরা তালিকায় নাম তুলেছেন, তাঁদের সকলেই রাষ্ট্রহীন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবেন। এইভাবে অসহায় ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষগুলির জীবন নিয়ে আবার তারা ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে।

আসাম চুক্তির সময়ে জাতিবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে অন্যায় চুক্তি করেছিলেন তাতে অসমীয়াদের জন্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। এখন উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা সেই সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবি তুলছে। একদিন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হলেও আজ আসাম তো বটেই, দেশের প্রতিটি প্রদেশেই বহু ভাষিক ভারতীয়ের বাস। সেখানে নির্দিষ্ট করে একটি ভাষিক গোষ্ঠীকে এই ভাবে সংরক্ষণ দিলে সংবিধান স্বীকৃত 'রাইট টু ইকুয়ালিটি'কেই নস্যাৎ করা হবে এবং এর ফলে দেশের সকল জনগণের ঐক্য এবং সংহতি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা ধ্বংস হয়ে যাবে। উগ্র জাতিবাদীদের এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তারা শুধুমাত্র আসু এবং উগ্রজাতিবিদ্বেষীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি ইতিমধ্যে যা বলতে শুরু করেছে, তা সর্বনাশা। তাঁদের অভিমত ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে কারা অসমীয়া তা নির্ধারণ করা হোক। এর দ্বারা আসামের জনগণকে দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেওয়া হবে— ১৯৫১ ভিত্তিবর্ষের একটি ক্যাটিগরি আর ১৯৭১ ভিত্তিবর্ষের আর একটি ক্যাটিগরি। তারা দাবি করছে, বিধানসভা, লোকসভা, চাকরি, পড়াশোনা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে যারা অসমীয়া তাদের জন্য কমপক্ষে ৮০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হবে। এই দাবি মেনে নিলে এর ফলে অ-অসমীয়া মানুষরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার হবে। বিরাট সংখ্যক মানুষ জীবন-জীবিকার অভাবনীয় সংকটের মধ্যে পড়বে। বাস্তবে এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া বাকি সমস্ত শক্তি এ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় শোষিত সব স্তরের জনগণকে একজোট করে শাসক শ্রেণির এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তুলে এনআরসি চালুর চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, আসামের পর এবার সারা দেশেই এনআরসি হবে। সব বিদেশিদের বিতাড়ন করা হবে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি নেতারা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করতে শুরু করে দিয়েছেন। দিল্লির বিজেপি সভাপতি বলেছেন, দিল্লিতে তাঁরা এনআরসি করবেন। তেলেঙ্গানা, হরিয়ানার বিজেপি সভাপতিরাও একই কথা বলেছেন। বিজেপি নেতারা পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘদিন ধরেই 'অনুপ্রবেশকারীদের' বিতাড়নের স্লোগান তুলে যাচ্ছেন। সম্প্রতি এ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় এনআরসি হবেই। বলেছেন, এ রাজ্যে অন্তত ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে। ঠিক আসামের জাতিবিদ্বেষী নেতাদের মতোই সেই একই কায়দা, একই সুর— মনগড়া একটা সংখ্যা যা হোক বলে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা, বিদ্বেষ তৈরি করা, জনজীবনের মূল সমস্যাগুলিকে আড়াল করে শোষিত মানুষের মধ্যেই দু'দলে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া। এদের মূল লক্ষ্য মুসলিম জনগণ। বিচারপতি সাচারের রিপোর্ট দেখিয়েছে, মুসলিমরা শোষিতদের মধ্যেও সবচেয়ে শোষিত। সমাজের সেই দরিদ্রতম অংশকেই বিজেপি আজ আক্রমণের লক্ষ্য করছে। এই মুসলিম-বিদ্বেষটাকেই তারা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায় এবং তার মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করতে চায়। দেশের মানুষ বিজেপির এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্র কিছুতেই মেনে নেবে না।

এ ব্যাপারে দেশের মানুষকে আসামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আসাম অর্থনৈতিক ভাবে একটা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাজ্য। বেকারি, গরিবি, মূল্যবৃদ্ধির সংকট মারাত্মক। অথচ তার আর্থিক উন্নয়নের কোনও প্রচেষ্টা না নিয়ে গত প্রায় চার দশক ধরে মানুষে মানুষে বিভাজনকেই সমস্ত শাসক দল তাদের রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। এর দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁদের অন্য সব কাজকর্ম ছেড়ে পাগলের মতো শুধু নথি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তারপরও এত বিপুল সংখ্যক ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যলঘু মানুষ নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ জীবন-মৃত্যুর মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ রাজ্যেও সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে সমস্যার শেষ নেই। বিজেপি নেতারা সেই সমস্যা সমাধানে কোনও দিন একটি কথাও উচ্চারণ করেননি, কোনও আন্দোলনও গড়ে তোলেননি। আজ বিদেশি বিতাড়নের নাম করে শোষিত মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে আবার রাজ্যের কোটি কোটি মানুষকে নাগরিকত্ব প্রমাণের অতি দুরূহ জটিল একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে সমাজ জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাইছে। এ ব্যাপারে তাঁদের ব্যগ্রতা থেকেই স্পষ্ট যে, নিপীড়িত জনসাধারণের স্বার্থ নয়, তাঁরা আসলে দেশের শাসক-শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় তাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজারের কাজই এর মধ্য দিয়ে করে চলেছে।

দেশের শ্রমজীবী গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে এ কথা বুঝতে হবে যে, শোষিত মানুষের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। হিন্দু ও মুসলমান গরিব শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ এক। জনজাতি ও অ-জনজাতি সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও পার্থক্য নেই। পরিশ্রম করে সংসার চালানো সব মানুষের শত্রু পুঁজিবাদী শাসন এবং পুঁজিপতি শ্রেণি। অসমীয়া হোক, বাঙালি হোক বা অন্য যে কোনও প্রদেশের মানুষ হোক, সকলকে আজ আসামের এনআরসি তালিকায় বাদ পড়া মানুষদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে সামিল হতে হবে। দেশের অন্য কোথাও এনআরসি চালুর অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। এর জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী, প্রাদেশিকতাবাদী চিন্তার বিপরীতে বামপন্থী ভাবাদর্শে, সাম্যবাদের ভাবাদর্শে উজ্জীবীত হয়ে পুঁজিবাদী শোষণ, নির্যাতন, বিভাজনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণআন্দোলনে সামিল হতে হবে। কারণ এই বামপন্থী তথা সাম্যবাদী ভাবধারাই ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক হিসাবে ভাবার শিক্ষা দেয়। এর মধ্য দিয়ে যেমন প্রাদেশিকতাবাদকে নির্মূল করা যাবে, তেমনই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের দাবিগুলিও আদায় করা যাবে।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১১)

ভাষা, সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)। এতে তিনি সাহিত্য-আলোচনার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, কাব্য মানে কেবল অলঙ্কৃত বাক্য নয়, প্রয়োজন সহৃদয়তা। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ পরে আলোচনা হবে। অন্য একটি বিশেষ কারণে তাঁর এই বইটির প্রসঙ্গ এখানে এল। বইটির উপসংহার অংশে তিনি একটি জরুরি বিষয় লিখেছেন, যেটা তাঁর কর্মসূচিকে উপলব্ধি করার সহায়ক। তিনি লিখেছেন, "ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবে না; এবং হিন্দী, বাঙ্গলা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।" বাস্তব পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে এই যে তিনি একটা কর্মসূচি উপস্থিত করলেন, এটুকু করেই ছাড়লেন না। সেই কর্মসূচি রূপায়ণে উদয়াস্ত পরিশ্রমে লিপ্ত হলেন। তাই তিনি তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় বাংলা ভাষাকে ক্রমশ উন্নত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। প্রায় সবকটি বইয়ের ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) দেখা যায় তিনি লিখছেন, 'এই রচনার সময় বাংলা ভাষাকে আরও সহজ-সরল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।'

বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন, অত্যন্ত আড়ম্বর ও কাঠিন্যের কারণে সংস্কৃত ভাষার চল আর নেই। কিন্তু, আদিরসাত্মক বর্ণনাগুলি বাদ দিলে, সংস্কৃত ভাষায় যে কাব্যসৌন্দর্য এবং দর্শন ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে, অতীতকে বোঝার জন্য সেসব যদি কেউ ভাল করে জানতে চায় তাহলে তাকে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়। অথচ ব্যাকরণের বিষম জটিলতার কারণে সেটা শেখা মোটেই সহজ নয়, দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় যথাসম্ভব সহজ করে সংস্কৃত ব্যাকরণের একটা বই লিখলেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১)। এর পর তিনি রামায়ণ-মহাভারত সহ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা থেকে নানা গল্প অনুবাদ করলেন এবং 'ঋজুপাঠ' নামে প্রকাশ করলেন। এসবের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল গতিবৃদ্ধি সম্ভব তো হয়েছেই। তার সাথে বিদ্যাসাগরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জীবনে-চরিত্রে যথার্থ মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা। যেমন, কবি কালিদাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি দেখালেন, কালিদাস শুধু বড় কবিই নন, তিনি ছিলেন নিরহং এক মানুষ। বিদ্যাসাগর লিখলেন, "কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ...এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।... রঘুবংশের প্রারম্ভে (কালিদাস) লিখিয়াছেন, ...'যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের

গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারিত করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব'।"(সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব)। কালিদাসের এই নিরহঙ্কারী মন বিদ্যাসাগরকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই মনের চর্চা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি নিজে করেছিলেন এবং অন্যদেরও করাতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী পালন করুন

বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, "বিদ্যাসাগর অ-সাধারণ মানুষ ছিলেন, একদম আপ-টু-ডেট। তাঁর মতন 'আধুনিক' মানুষ আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে জন্মায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আপ-টু-ডেট বলতে আড়াইজন মানুষের নাম করতে পারি। একজন বিদ্যাসাগর, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ, আর অর্ধেক হলেন রামমোহন রায়।... বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রগণ্য।" বাংলা গদ্যরীতির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সেন লিখেছেন, "বাঙ্গালা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসমতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিমিত ও লালিত্য সঞ্চার করাইয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন।... তিনি বাঙ্গালা গদ্যের তাল বাঁধিয়া দিলেন।" বাস্তবে বিদ্যাসাগরের হাতে এ এক নতুন সৃষ্টি। পুরনো সমস্ত প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটিয়ে তিনি ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটালেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে জ্ঞানচর্চার উর্বরতর জমি তৈরি করলেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাই লিখেছেন, "হিন্দু কলেজের শিক্ষিত সমাজকে ইয়ং বেঙ্গল বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগরীয় রীতির শিক্ষিত সমাজকে মডার্ন ম্যান বলা অন্যায় হইবে না। বিংশ শতক বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজের উত্তরপুরুষ— বিদ্যাসাগরকে তাহার আত্মীয় মনে না হওয়া অসম্ভব।... মায়ের মুখের ভাষা মাতৃভাষা— এখানে বিদ্যাসাগরকে মাতা মনে করিলে অন্যায় হইবে না— তাঁহার মুখের ভাষা পরবর্তী যুগকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে ;তাঁহার কলমের গাছে অত্যল্প কালের মধ্যে অপূর্ব নব্য গদ্যের সুফল ফলাইয়াছে।"

অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির পরিবর্তে সঙ্গত যুক্তি ও বিচারধারার যে যুগ, ভারতে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর। যে-কোনও ধরনের উগ্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে তিল তিল করে এই যুগ নির্মাণ করেছেন তিনি। হাতে-কলমে গড়েছেন নতুন চরিত্র, যারা যথার্থ জ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল মশাল বহন করবে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রথম জীবনে অক্ষয়কুমারের উপর প্রভাব ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে প্রার্থনায় মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি অক্ষয়কুমারকে প্রভাবিত করতে পারলেন না। অক্ষয়কুমার বললেন, প্রার্থনা নয়, পরিশ্রমেই মুক্তি। কৃষকরা পরিশ্রম করে শষ্য পায়, প্রার্থনা দ্বারা নয়। জীবনযাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন, দেখা যায় সেসবই একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়েই উৎপাদন করা সম্ভব। তা হলে,

পরিশ্রম = ফসল

পরিশ্রম + প্রার্থনা = ফসল

অতএব, প্রার্থনা = শূন্য (০)

১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমার একটা বই প্রকাশ করলেন, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। তারপর 'চারুপাঠ' (১৮৫৩)-এর প্রথম ভাগ-এ লিখলেন, "...জন্তুর ন্যায় কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের ধর্ম্ম নয়।... আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া, স্বদেশের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ সম্পাদনার্থ যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।" এইসব বইগুলিকে ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

ইতিমধ্যে তিনি হাত দিয়েছেন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'-এ। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) প্রকাশ নানা কারণে সাহিত্যজগতে বিদ্যাসাগরের এক অনবদ্য কাজ। সংস্কৃত নাটক থেকে বাংলা কাহিনী করার কোনও সম্যক দৃষ্টান্ত এর আগে ছিল না। অথচ, মূল গ্রন্থের কোনও রকম বিকৃতি না ঘটিয়ে বাংলায় শকুন্তলাকে যে ভাবে পুনরাবিষ্কার করলেন বিদ্যাসাগর, তা আজও তাবড় সাহিত্যবিশারদকে বিস্মিত করে। এই কাহিনীর ভাষায়-সংলাপে এবং মানবমনের কোমল হৃদয়গ্রাহী আবেদনকে বিদ্যাসাগর নিখুঁত শিল্পের মতো করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই আজও সাহিত্যবিদদের মতে, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ আক্ষরিকতার সীমা ছাড়িয়ে ভাবধর্মী হয়েছে এবং প্রায় নতুন সৃষ্টিরই আকার ধারণ করেছে।

'শকুন্তলা'র মতো এমন একটা সৃষ্টিতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন কারণ, অন্যান্য কাহিনীর ক্ষেত্রেও যেমন, নিছক একটা গল্পপাঠ করাতে তিনি চাননি। তাহলে কী চেয়েছিলেন? যেটা চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট করে কোথাও তিনি লেখেননি। শরৎসাহিত্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, জীবনের সঠিক পথকে "যারা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন তাঁদের জন্য তো তত্ত্বের আকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-ই রয়েছে। তাহলে সাহিত্যের প্রয়োজন কী? ...যারা তেমন শিক্ষার বনিয়াদ এবং ক্ষমতা না থাকার জন্য যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে বড় কথাগুলো গ্রহণ করতে পারেন না— রসসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে তাঁদের মনেও সেটা খানিকটা গেঁথে দেওয়া। এই কাজটি করার জন্যই তো সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা।" বিদ্যাসাগর এই কাজটাই করেছেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন আদ্যন্ত কর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর দর্শন ছিল, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" তাঁর সামনে পুরনো জরাজীর্ণ সমাজকে ভেঙে গড়ার কাজ ছিল বিস্তর। কর্মপ্রেরণা এবং কর্মপথ সৃষ্টির তাগিদে তাঁকে আসতে হয়েছিল ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মকে তাঁর কূপমণ্ডুক সমাজকে ভাঙার লড়াই থেকে আলাদা করা যায় না। নতুন যুগের নতুন যুক্তি-বিচার ধারার আপাত নীরসতাকে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাকে সত্য জানতে শেখানো ও সামাজিক স্বার্থে চরিত্রকে গড়ে তুলে সক্রিয় করা— এই ছিল বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য।

ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বিস্তৃত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যথোপযুক্ত উপলব্ধির জন্য তাঁর এই উদ্দেশ্যবোধ ভাল করে জানা জরুরি। জীবনের এই উদ্দেশ্য তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল আকস্মিক ভাবে নয়, বরং একটা ধারাবাহিকতায়। সেই কালপর্ব হল এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পর্ব। সে সময় ইংরেজি ভাষা অনেকেই শিখেছিলেন। ইংরেজি ভাষার সাহিত্যের কিছুটা রসোপলব্ধি করার যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু যাকে বলে 'স্পিরিট অফ ইংলিশ'— অর্থাৎ, ষোড়শ শতকে ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যে মানবতাবাদী চিন্তাধারা ঐতিহাসিক ভাবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত, সেই চিন্তাধারাকে নিজের জীবনে কার্যকরী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই তিনি কখনও বহুমূল্য পোশাক পরে সাহেবিয়ানা দেখাননি। বা নিজেকে 'আধুনিক' প্রমাণ করার জন্য কোনও বিশেষ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে হয়নি। এই কারণেই, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ফার্স্ট ম্যান অ্যামং আস'। এই 'ম্যান'-এর অর্থ হল, ঐতিহ্যবাদ থেকে মুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী মানুষ। তার সাথে, জাত-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি পরিচয় ছেড়ে কেবলমাত্র দোষ-গুণের আধারে মানুষকে দেখেন— এমন ব্যক্তিত্বকেই মাইকেল 'ম্যান' বলেছেন। তাঁর 'ম্যান' আদতে সমাজের সর্বাংশে মানবতাবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার যোদ্ধা। সেই অর্থেই বিদ্যাসাগর এদেশে 'ফার্স্ট ম্যান'। তাই তাঁর আগে অনেকেই বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালুর প্রসঙ্গ তুললেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রবল প্রতাপশালী রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে সেভাবে দাঁড়াতে পারেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর অটল ভাবে দাঁড়িয়ে অবিচল লড়েছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষা ও বাংলা গদ্যশৈলীকে তিনি আসন্ন এক যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো করে গড়েছিলেন, তার ভূমিকা অসামান্য। যেমন, ১৮৫৫ সালে তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অন্যতর প্রশস্ত পথের সন্ধান দেয়।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আন্দোলনে

পূর্ব বর্ধমান ঃ গত কয়েক বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার চাষিদের এ বছরের বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি দিল বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা। কার্জন গেটে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস। নেতৃবৃন্দ দেখান বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা এন টি পি সি-র উৎপাদন ব্যয় ইউনিট প্রতি কমেছে ৯৩ পয়সা থেকে ১৬৫ পয়সা। কয়লার দাম, জি এস টি, কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি ইত্যাদি মিলিয়ে ৪৯ শতাংশ খরচ কমেছে। ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির লাভ হয়েছে ৬,৩৭৮ কোটি টাকা। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ৫০ শতাংশ কমানো যায়।

পূর্ব বর্ধমান

বীরভূম

ঝাড়গ্রাম ঃ দিল্লির মতো এ রাজ্যেও ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত অর্ধেক দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার দাবিতে অ্যাবেকা ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। জঙ্গলমহলে ২১টি ব্লকে অশান্ত পর্বের বকেয়া বিল মকুব করা, কাটা লাইন জুড়ে দেওয়া সহ তাঁদের দাবি, এল পি এস সি-র নামে চড়া হারে সুদ আদায় বন্ধ করা, বন্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ মিটারে মনগড়া বিল পাঠানো বন্ধ করা, কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া, বিপজ্জনক বাঁশের খুঁটি পরিবর্তন করে নিরাপদ পোল ও তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি। এই দাবিতে কয়েকশো বিদ্যুৎ গ্রাহকের প্রতিবাদ মিছিল কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ঝাড়গ্রাম শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন তপন রায়, জগদীশ মাহাত, ভোলানাথ প্রতিহার প্রমুখ।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)

২১ অক্টোবর হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) ১০টি জেলার ১৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ভিওয়ানি, তোশাম, বাদশাপুর, গুরগাঁও, হাঁসী, বাহাদুরগড়, অসনধ, অটেলি, নারনোল, নাঙ্গল চৌধুরি, কোসলি, রেওয়াড়ি, রাই, সোনীপত এবং গোহনো সহ মোট ১৮টি কেন্দ্রে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দলের পলিটবুরো সদস্য তথা দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান এই সংবাদ জানান।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ডিনডোসি (মুম্বই) এবং হিঙ্গনা (নাগপুর) কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এসইউসিআই(সি)। কমরেড সত্যবান বলেন, বিজেপি সরকার অতীতের কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলিই আরও জোর কদমে কার্যকর করে চলেছে। আর দু'চারটে সিট পাওয়ার লোভে সিপিএম-সিপিআই কংগ্রেসের পিছন পিছন চলছে।

হরিয়ানার ঘরে ঘরে রয়েছে প্রতিভাবান, সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা। তাদের কাজ নেই। রাজ্যের ৪২৯টি সরকারি স্কুলে বিজ্ঞান ও গণিত পড়ানো তুলে দেওয়া হয়েছে। রেওয়াড়ির মনেধিতে প্রস্তাবিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এইমস বন্ধ করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি তথা মনোহরলাল খট্টরের বিজেপি সরকার। এই পরিস্থিতিতে গণআন্দোলনের ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরে এস ইউ সি আই (সি) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

আন্দোলনের চাপে দাবি আদায় গাইঘাটা হাইস্কুলে

উত্তর ২৪ পরগণায় গাইঘাটা হাইস্কুলের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের দু'বছরের পোশাকের টাকা প্রদান, ল্যাবরেটরির ২ লক্ষ টাকা ও বিদ্যালয় উন্নয়ন খাতের ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অবিলম্বে কাজে লাগানোর দাবিতে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র ও অভিভাবকরা গড়ে তোলেন 'গাইঘাটা হাইস্কুল শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'। কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৩ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা হাইস্কুল গেটে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক সকাল ১০ টা থেকে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। এক ঘণ্টার উপর বিক্ষোভ চলার পর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিক্ষোভস্থলে এসে প্রতিশ্রুতি দেন, এক মাসের মধ্যে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরপর বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। কমিটির পক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন রূপম ভৌমিক, সুমন গোলদার, অনিমা দেবনাথ, বিপ্লব ঘোষ, শিবানী মজুমদার, স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ।

অল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস মিট

এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রথম অল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস মিট অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ থেকে উপস্থিত ছাত্র প্রতিনিধিরা কারিগরি শিক্ষায় উপযুক্ত প্লেসমেন্টের সমস্যা, প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত সমস্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বেসরকারিকরণ সহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভায় বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত বেরা, আইআইএসইআর কলকাতার অধ্যাপক ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এআইডিএসও-র রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা। চন্দন সাঁতরা ও বিদ্যুৎ মাইতিকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১০ জনের সারা বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়। কনভেনশন থেকে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

ধর্ষক বিজেপি নেতার শাস্তি চাই

পূর্বতন বিজেপি সরকারের মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দ এক বছর ধরে ধর্ষণ-নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন উত্তরপ্রদেশের এক ছাত্রীর উপর। সম্প্রতি ছাত্রীটি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও সাধুবেশী এই ঘৃণ্য দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের গড়িমসি লক্ষ করা যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরে এআইএমএসএস-এর নেতৃত্বে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান।

প্রকাশিত হচ্ছে
কমরেড নীহার মুখার্জী নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ

গণদাবীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৮ অক্টোবর।

যুব বিক্ষোভ খড়্গপুরে

রেলে শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দু'লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে ডি আর এম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ইরফান আলি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক সুশান্ত পাণিগ্রাহী, প্রদীপ ওঝা, সঙ্গীতা ভক্ত, স্নেহলতা সাহু প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com